ইক্যুইটিবিডি খসড়া অবস্থানপত্র, ৫ ডিসেম্বর ২০০৪

কপ ২৯ এর ফলাফল এবং ভবিষ্যত করণীয় বিষয়ে নাগরিক সমাজের অভিমত

বাংলাদেশকে নিজস্ব সম্পদ নির্ভর জলবায়ু পরিকল্পনা করতে হবে

১. প্রারম্ভিকা

বাকু জলবায়ু সম্মেলনের [কপ-২৯] আসর ১১ নভেম্বর থেকে শুরু হয়ে ২২ নভেম্বর শেষ হওয়ার কথা থাকলেও অর্থায়নের বিষয়ে দেশগুলোর মধ্যে সমঝোতা না হওয়ায় আরো এক দিন বৃদ্ধি করা হয়। ২৫০ বিলিয়ন ডলারের খসড়া প্রস্তাব ক্ষতিগ্রস্থ দেশগুলো প্রত্যাখ্যান করে এবং সম্মেলন বর্জনের ঘোষণা দেয়, পরবর্তীতে, ধনী দেশগুলো ২০৩৫ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর ৩০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার দিতে সম্মত হয়। নাগরিক সমাজ, একটিভিস্ট ও বিশেষজ্ঞদের দাবি উন্নত বিশ্ব জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং ১.৩ ট্রিলিয়ন ডলারের [বৈশ্বিক জিডিপির মাত্র এক শতাংশ] দাবির প্রেক্ষিতে এই পরিমাণ 'প্রতারণামূলক', 'লজ্জাজনক' এবং 'আপত্তিকর'।

টিকে থাকার প্রশ্ন এখন স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ণ [এমাভসি] এবং ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্রগুলির জন্য ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে এবং তাদের মতে এই তহবিল বরাদ্দ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি কাটিয়ে উঠার সক্ষমতা অর্জনের চাহিদা মেটাতে পারবে না বরং জলবায়ু অর্থায়নের নামে ঋন নির্ভরতা বাড়াবে, এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোকে নিজেদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতার দিকে ঠেলে দেবে। তাই ভবিষ্যৎ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় ঋণ নির্ভর পরিকল্পনার পরিবর্তে নিজস্ব সম্পদ নির্ভর অংশগ্রহণমূলক ও অঞ্চলভিত্তিক পরিকল্পনা তৈরির উপর গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন।

২. সম্মেলনে বড় অর্থনীতির দেশগুলোর নেতাদের অনুপস্থিতি ছিলো উদ্বেগের কারণ

বড় অর্থনীতির দেশগুলোর অনেক বিশ্ব নেতাই এবারের সম্মেলনে যোগ দেননি, যা বৈশ্বিক দক্ষিণের দেশগুলির জন্য গভীর উদ্বেগের কারণ ছিল। জি-২০ দেশগুলিই বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য দায়ী, তারাই ৮০ শতাংশ গ্রীনহাউজ গ্যাস নির্গত করে এবং বিশ্ব অর্থনীতির প্রায় ৮৫ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, জাপান, ভারত এবং ফ্রান্স সহ অন্যান্য প্রধান অর্থনীতির নেতাদের অনুপস্থিতি এবং আর্জেন্টিনার মধ্যবর্তী সময়ে সম্মেলন বয়কট জলবায়ু অর্থায়নের ভবিষ্যত অগ্রগতি সম্পর্কে সন্দেহের জন্ম দিয়েছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরিবর্তনের এই সময়ে, বিশেষ করে মার্কিন পেসিডেন্ট নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাম্প্রতিক বিজয় এবং তার প্রশাসনের সম্ভাব্য জলবায়ু নীতি ও বিশ্বনেতাদের অনুপস্থিতি এবারের সম্মেলনের শুরুতেই যথেষ্ট উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার জন্ম দিয়েছিলো।

৩. বাকু জলবায়ু সম্মেলনের [কপ-২৯] উল্লেখযোগ্য আলোচনার ফলাফল,পর্যালোচনা ও সুপারিশসমূহ

ক. বৈশ্বিক ১.৫ ডিগ্রি তাপমাত্রার লক্ষ্য অর্জন [এখনো অস্পষ্ট]

বৈশ্বিক তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে দুবাই [কপ-২৮] সম্মেলনে জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে সরে যাওয়ার যে আহবান ছিলো এবারের আলোচনায় সে বিষয়ে কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি যা দেশগুলোকে জ্বালানি তেলের ব্যবহার থেকে সরে যাওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে পারতো। বরং সৌদি আরবসহ বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম তেল উৎপাদনকারী দেশগুলো স্পষ্টভাবেই এর বিরোধীতা করেছে এবং বলেছে "তেলসম্পদ ইশ্বরের দেয়া উপহার"। বিশেষজ্ঞরা বলছে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার থেকে সরে আসার ঘোষনার জন্য আলোচনায় যে ধরনের ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে তা ছিলো অত্যান্ত দুর্বল। অথচ গত বছরের তুলনায় এবছর বৈশ্বিক উষ্ণায়নের জন্য দায়ী গ্যাসগুলোর নিঃসরণ বেড়েছে প্রায় ১ শতাংশ।

ওয়ার্ল্ড এনার্জি রিপোর্ট এর প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০২৩ সালে বিশ্বব্যাপী শক্তির উৎস হিসেবে ৮১.৫% জীবাশ্ম-জ্বালানি ব্যবহৃত হয়েছে, অথচ সর্বোচ্চ দূষণকারী দেশগুলির প্রস্তাবিত এনডিসিগুলোর লক্ষ্যমাত্রা যথেষ্ট বিভ্রান্তিকর [২০৬০-২০৭০ সাল মেয়াদী]। আর এদিকে ২০৩০ সালের মধ্যে এলডিসিভুক্ত দেশগুলোর প্রস্তাবিত এনডিসি অর্জনের জন্য প্রয়োজন বার্ষিক ৪৫৫-৫৮৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। দুবাই সম্মেলনে 'গ্লোবাল স্টকটেক' এর বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো কীভাবে বাস্তবায়ন করা হবে সে বিষয়ে দেশগুলো এবারের সম্মেলনে ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারেনি, যা পরবর্তী সম্মেলনে আলোচনার জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে, অথচ বৈশ্বিক তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রী সীমাবদ্ধ রাখতে এই আলোচনা অগ্রাধিকারে থাকা উচিত ছিলো।

বিশ্লেষকরা মনে করছে, উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনার পরিবর্তে বাংলাদেশের উচিৎ হবে নিজস্ব সক্ষমতা অনুযায়ী এনডিসি-০৩ পর্যালোচনা করা ও সে অনুযায়ী লক্ষ্য নির্ধারণ করা। পাশপাশি বৈশ্বিক উষ্ণতা ১.৫ ডিগ্রীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে ২০২৫ সালের আগে উন্নত ও দূষণকারী রাষ্ট্রগুলোর নতুন এনডিসি-৩ তৈরির লক্ষমাত্রায় উচ্চাকাংখার প্রতিফলন নিশ্চিত করতে জোড়ালো দাবি তুলে ধরতে হবে।

খ. প্যারিস চুক্তির অনুচ্ছেদ-৬ এর আওতায় কার্বন ট্রেডিং মার্কেটের পরিপূর্ণ বাস্তবায়নে ঐক্যমত্যে

গত এক দশকের আলোচনার পর কার্বন ট্রেডিং মার্কেট পুরোপুরি বাস্তবায়নে সম্মত হয়েছে অংশগ্রহণকারী দেশগুলো, প্যারিস চুক্তির অনুচ্ছেদ ৬.২ এর অধীনে এক দেশ অন্য দেশের সাথে সহজে কার্বন বাণিজ্য করতে পারবে এবং অনুচ্ছেদ ৬.৪ এর অধীনে, প্রতিটি দেশ কার্বন- বাজার কেন্দ্রিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে পারবে। চুক্তি অনুযায়ী, বনায়ন ও বায়ুবিদ্যুৎ উৎপাদনের মতো প্রকল্প গ্রহণ করতে পারবে উন্নয়নশীল ও দরিদ্র দেশগুলো। প্রতি টন কার্বন ডাই-অক্সাইড বা গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ কমানোর বিনিময়ে নির্দীষ্ট পরিমাণ 'কার্বন ক্রেডিট' পাবে তারা। এরপর বৈশ্বিক বাজার থেকে ওই 'ক্রেডিট' কিনে বিভিন্ন দেশ ও প্রতিষ্ঠান নিজেদের নিঃসরণ কমানোর জন্য ব্যবহার করতে পারবে।

বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এই ব্যবস্থা বড় দেশগুলোকে সুবিধা দিলেও ছোট দেশগুলোর জন্য সুবিধা আদায় করার সম্ভাবনা

কম, এবং এই প্রক্রিয়া বৈশ্বিক দক্ষিণের দরিদ্র জনগোষ্ঠী, আদিবাসী ও ক্ষুদ্র কৃষকদের ওপর বিরুপ প্রভাব ফেলতে পারে। কিন্তু প্রথমত, কার্বন ট্রেডিং মেকানিজমের জন্য বাংলাদেশের প্রস্তুতি কতটা? অনেকের ধারনা, সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে বাংলাদেশ উন্নত দেশগুলো কর্তৃক প্রতারিত হতে পারে। দ্বীতিয়ত, বাংলাদেশের জন্য অগ্রাধিকার কোনটি অভিযোজন না প্রশমন? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলতে চাই, বাংলাদেশের অগ্রাধিকার অবশ্যই অভিযোজন কার্বন বানিজ্য নয়।

গ. অর্থায়ন; নতুন সম্মিলিত জলবায়ু অর্থায়ন লক্ষ্যমাত্রা [এনসিকিউজি]

৩০০ বিলিয়ন ডলারের বার্ষিক প্রতিশ্রুতি এলডিসি, এমভিসি ও ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্রগুলোর প্রয়োজনীয় ন্যূনতম ১.৩ ট্রিলিয়ন ডলারের চাহিদার তুলনায় খুবই কম, এই বরাদ্দ ঝুঁকিগ্রস্থ দেশগুলোর জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষয়-ক্ষতি কাটিয়ে উঠার সক্ষমতা অর্জনের চাহিদা মেটাতে মোটেই যথেষ্ট নয় বরং জলবায়ু অর্থায়নের নামে ঋন নির্ভরতা বাড়াবে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোকে নিজেদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতার দিকে ঠেলে দেবে।

এবারের সম্মেলনে জলবায়ু কার্যক্রমে বেসরকারি বিনিয়োগের বিষয়গুলো প্রাধ্যান্য পেয়েছে,নতুন সম্মিলিত জলবায়ু অর্থায়নের খসড়ায় অনুচ্ছেদ ৮(সি) তে বহুপাক্ষিক উন্নয়ন ব্যাংকগুলোর অর্থায়নের বিষয় স্পষ্ট করা হয়েছে। চুক্তিতে বার্ষিক এক দশমিক তিন ট্রিলিয়ন ডলারের বিস্তৃত জলবায়ু অর্থায়নের কথাও বলা হয়েছে যে, ২০৩৫ সালের মধ্যে উন্নয়নশীলদেশগুলোতে অর্থায়ন বৃদ্ধি করা যেতে পারে যদি প্রাইভেট ও বহুপাক্ষিক উন্নয়ন ব্যাংকগুলোর প্রতিশ্রুতি মেলে।

সবচেয়ে বড় কথা, বরাদ্দ প্রক্রিয়া ও তহবিলের কাঠামো নিয়ে এলডিসি, এমভিসি ও ক্ষুদ্র দ্বীপ রাস্ট্রগুলোর পক্ষ থেকে দাবি তোলা হলেও উন্নত দেশগুলো সুকৌশলে তা এড়িয়ে গেছে। ক্ষতিগ্রস্থ দেশগুলো এখনো জানে না এই প্রতিশ্রুত ৩০০ বিলিয়ন তহবিল ঋণ, অনুদান বা অত্যন্ত ছাড়ভিত্তিক হবে কিনা বা হলেও কি পরিমাণ অথবা ছাড়করণের ক্ষেত্রে কোন প্রক্রিয়া অনুসরন করা হবে অর্থলগ্নীকার প্রতিষ্ঠান, সরকার টু সরকার [জি টু জি] অথবা জিসিএফ এর মতো কঠিন শর্তযুক্ত।

জলবায়ু অর্থায়নের সুস্পষ্ট সংজ্ঞা নির্ধারন করতে এবং কিভাবে ও কখন কোন দেশ অর্থ দেবে তা বাধ্যবাধকতার আওতায় আনতে বাংলাদেশকে অব্যাহতভাবে অ্যাডভোকেসি করে যেতেই হবে। কোনটি জলবায়ু অর্থায়ন আর কোনটি নয় বিষয়গুলোর সুস্পষ্ট সুরাহা হওয়া উচিৎ অন্যথায় ধনীদেশগুলো যে কোন অর্থায়নকেই জলবায়ু অর্থায়নের নামে জোড়করে চাপিয়ে দেবে। পাশাপাশি বাংলাদেশকে ঋণ নির্ভর পরিকল্পনা থেকে বিরত থাকতে নিজস্ব সম্পদের উপর ভিত্তি করে পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে।

ঘ. অভিযোজন; গ্লোবাল গোল অন অ্যাডাপটেশন [জিজি-এ]

জিজি-এ এর অগ্রগতি পরিমাপ করতে কি ধরনের সূচক ব্যবহার করা হবে তা নির্ধারণের জন্য দেশগুলি একটি দুই বছরের উদ্যোগ গ্রহণে সম্মত হয়েছিলো, কিন্ত বিভাজন স্পষ্ট হয়ে উঠে এবং আলোচনা স্থগিত হয়ে পড়ে যখন "বাস্তবায়নের কৌশল" নির্ধারনের জন্য সূচকগুলোতে সক্ষমতা-উন্নয়ন, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও উন্নয়নশীল দেশগুলির জন্য অর্থ সহায়তার মতো বিষয়গুলোর প্রতি ইংগিত করা হয়। ২০৩০ সালের মধ্যে অভিযোজনে অর্থায়ন প্রয়োজন আনুমানিক ২১৫-৩৮৭ বিলিয়ন অথচ খসড়ায় উন্নয়নশীল দেশগুলির জন্য অভিযোজন কৌশলগুলির বিষয়ে কোনও স্পষ্ট ইঙ্গিত নেই যা জলবায়ু আর্থিক সহায়তার ক্ষেত্রে একটি বিপর্যয়কর ব্যর্থতার উদাহরণ। এলডিসি, এমভিসি ও ক্ষুদ্র দ্বীপ রাস্ট্রগুলোর কোটি-কোটি মানুষ যেখানে অভিযোজনের মাধ্যমে বাঁচার লড়াই করছে, জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে, অথচ এখানে দৃষ্টি না দিয়ে কার্বন বানিজ্যের মতো বিষয়গুলোকে অগ্রাধিকার দেয়াটা কতটা যৌক্তিক ও নায্য?

আর্থিক কাঠামো সংস্কার না করে গতানুগতিক প্রক্রিয়ায় অর্থায়ন করা হলে আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর অভীষ্টলক্ষ্য অর্জীত হলেও বাংলাদেশের মতো অতি জলবায়ু বিপদাপন্ন দেশগুলোর প্রকৃতভাবে উপকৃত হবেনা। প্রশমনের ক্ষেত্রে অর্থায়ন হলেও অভিযোজনের জন্য বরাদ্দ খুব কমই পাওয়া যাবে তাই বাংলাদেশের উচিত হবে প্রতিশ্রুত ৩০০ বিলয়িন তহবিলে প্রশমন এবং অভিযোজনের জন্য সুনির্দীষ্টভাবে [৫০ :৫০] তহবিল পৃথকীকরণ, জিজি-এ এর সংজ্ঞায়ন, অভিযোজন এবং সক্ষমতা উন্নয়নের সূচকগুলো সুনির্দীষ্ট করতে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আলাপ আলোচনা অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাওয়া। পাশাপাশি ভবিষ্যৎ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় পূর্বের ঋণ-ভিত্তিক জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনার পরিবর্তে অংশগ্রহণমুলক প্রক্রিয়ায় অঞ্চলভিত্তিক চাহিদা বিবেচনায় ও বাংলাদেশের নিজস্ব সম্পদ নির্ভর জলবায়ু অভিযোজন পরিকল্পনা তৈরির উপর গুরুত্ব দেয়া।

ঙ. লস অ্যান্ড ড্যামেজ তহবিল

উন্নত দেশগুলোর পক্ষ থেকে বলা হয়,লস অ্যান্ড ড্যামেজ তহবিল-এর আলোচনা কপ ২৮ এর এজেন্ডাতেই শেষ হয়েছে সুতরাং আলাপ-আলোচনা ওখানেই আটকে যায়। বাকু জলবায়ু সম্মেলনকে বলা হয়েছিলো অর্থায়নের সম্মেলন, কিন্তু সর্বাধিক বিপদাপন্ন দেশগুলোর অভিযোজন ও লস অ্যান্ড ড্যামেজ এর মতো ইস্যুকে অগ্রাধিকারে না রেখে 'কার্বন-ক্রেডিট' কিংবা 'ফলস সলিউশনকে' প্রমোট করার চেষ্টা করা হয়েছে।

ক্ষয়-ক্ষতি মোকাবেলায় ২০৩০ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোর বার্ষিক ৪৪৭-৮৯৪ বিলিয়ন ডলার আনুমানিক ব্যয় এর বিপরীতে মাত্র ৭২৯ মিলিয়ন তহবিলের প্রতিশ্রুতি সাগরের মধ্যে এক বিন্দু ফোঁটা সাদৃশ্য। তহবিলটি ২০২৫ সাল থেকে বিতরন প্রক্রিয়া শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়া হলেও সহজলভ্যতা ও প্রক্রিয়াগত বিষয়গুলোর প্রশ্ন এখনো অমীমাংষিতই রয়ে গেছে।

বাংলাদেশকে সুস্পস্ট প্রমাণাদিসহ অ-অর্থনৈতিক ক্ষয়-ক্ষতির মূল্যায়ন করতে হবে এবং এবং জিসিএফের মতো কঠিন শর্তে নয় অনুদানভিত্তিক,সহজলভ্য, দ্রুত, বাধ্যবাধকতাসম্পন্ন ও ক্ষতিগ্রস্থ দেশগুলোর অগ্রাধিকারভিত্তিক তহবিলের জন্য অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্থ দেশগুলোকে সাথে নিয়ে লবিং করে যেতে হবে।

চ. প্যারিসচুক্তির আর্টিকেল -১৩ এর আওতায় স্বচ্ছতা-প্রতিবেদন

প্রতিটি দেশকে প্রতি ২ বছরে একবার দ্বিবার্ষিক স্বচ্ছতা প্রতিবেদন (বিটিআর) জমা দেয়ার কথা থাকলেও কপ-২৯ এর আগে মাত্র ১৩টি দেশ এই প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। এনহান্সড ট্রান্সপারেন্সি ফ্রেমওয়ার্ক [ইটিএফ] শক্তিশালী করার মাধ্যমে

রাষ্ট্রভিত্তিক কার্যকর অগ্রগতি মূল্যায়ন করা অতীব জরুরি, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কোন দেশ কতটুকু কার্বন নি:সরনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে তা স্পষ্ট করতে হবে। আমরা মনে করি ধনী দেশগুলোর নিজেদের মধ্যেই স্বচ্ছতার যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে, বিশেষ করে প্রশমন ভিত্তিক তহবিলের ক্ষেত্রে দিগুন গণনার অভিযোগ রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে। প্রতিটি দেশকে অবশ্যই তার অর্থনীতি-বিস্তৃতির উপর ভিত্তি করে কার্বন নি:সরন অর্জনের প্রতিবেদন [ইকোনোমি ওয়াইড কার্বন রিডাকশন অ্যাচিভম্যান্ট রিপোর্ট] জমা দিতে এবং দ্বিগুণ গণনা এড়াতে এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে সুস্পষ্ট জলবায়ু অর্থায়নের সংজ্ঞা নির্ধারনের জন্য বাংলাদেশের উচিত হবে বৈশ্বিক পরিমন্ডলে আলাপ আলোচনাগুলো অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাওয়া।

৪. বাংলাদেশের পরবর্তী ভূমিকার জন্য সুপারিশসমূহ

ক. তহবিলের স্বল্পতায় বাড়বে প্রতিযোগিতা নিজস্ব সম্পদের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশকে পরিকল্পনা করতে হবে

নতুন জলবায়ু অর্থায়ন তহবিলের স্বল্পতা তহবিল প্রাপ্তিতে বাংলাদেশকে প্রতিযোগিতায় ফেলবে যার ফলে বাংলাদেশকে অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলোর সাথে তীব্র প্রতিযোগিতায় অবতীর্ন হতে হবে। ৩০০ বিলিয়ন তহবিলের অনুদানের অধিকাংশই হতে পারে প্রশমন নির্ভর, বাংলাদেশ সহ অন্যান্য সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর অভিযোজন চাহিদা যেহেতু বেশি, তাই ধারনা করা যায় অভিযোজনে অনুদানভিত্তিক অথবা অতি-ছাড়যুক্ত অর্থায়নের বিষয়টি বরাবরের মতোই উপেক্ষিত থাকতে পারে এবং সেক্ষেত্রে প্রশমন অগ্রাধিকার পাবে। অর্থায়ন ঋণ কিংবা অতি-ছাড়যুক্ত যে প্রক্রিয়ায় হোক না কেন বিবেচনার বিষয় হচ্ছে আমাদের প্রস্তুতি কতটা। ছাড়যুক্ত বা ঋণভিত্তিক অর্থায়ন যে প্রক্রিয়ায় হোক না কেন সেটা অবশ্যই শর্তযুক্ত হবে এবং প্রাপ্ত তহবিলের অধিকাংশই বিদেশী কনসালটেন্ট ও গবেষনার পেছনে ব্যায় হবে। সুতরাং বিষয়গুলো বিবেচনয়া রেখে বাংলাদেশকে নিজস্ব সম্পদের উপর ভিত্তি করে প্রস্তুতি নিতে হবে।

খ. পূর্বের গৃহীত পরিকল্পনাগুলো ঋন নির্ভর জাতীয় বাজেটের সাথে সমন্বয় করে অংশগ্রহণমুলক প্রক্রিয়ায় অঞ্চলভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ জরুরী

পূর্বে যে সমস্ত পরিকল্পনা [যেমন- মুজিব ক্লাইমেট প্রসপারেটি প্ল্যান, জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা-ন্যাপ, কার্বন নির্গমন হ্রাসে জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অবদান-এনডিসি ইত্যাদি] প্রণয়ন করা হয়েছে সে সমস্ত পরিকল্পনায় প্রকল্প ভিত্তিক অর্থ যোগান ও এর যথেচ্ছ ব্যয়কেই প্রধান্য দেয়া হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন, দুর্নীতি হ্রাসে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার কৌশল, সর্বাধিক ঝুঁকিগ্রস্থ ভৌগলিক অঞ্চল ও জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা উন্নয়নে অর্থায়নের কৌশলসহ নানাবিধ বিষয়ে দিক নির্দেশনার ঘাটতি রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় প্রণীত এসকল কর্মপরিকল্পনা মূলত বৈদিশিক ঋণ নির্ভর এবং তাই এসব জলবায়ু নীতি-পরকিল্পনায় প্রয়োজনীয় পরর্বিতন ও সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে। জাতীয় বাজেটের সাথে সমন্বয় করে নতুন ও অংশগ্রহণমুলক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে যা অঞ্চলভিত্তিক চাহিদাকে প্রতিফলিত করবে, অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় অঞ্চলভিত্তিক জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ করা গেলে স্থানীয় চাহিদাগুলো গুরুত্ব পাবে এবং বাজেট কম হলেও বাস্তায়বায়ন সম্ভব হবে। আগের গৃহীত পরিকল্পনাগুলোর বেশিরভাগই প্রকল্প নির্ভও হওয়ার কারনে পুরোটাই ঋণ নির্ভর, ঋণ ছারা এসকল প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়, এই ধরনের প্রকল্পগুলো জাতীয় বাজেটের সাথে খুব কমই সম্পর্কিত। অঞ্চলভিত্তিক চাহিদানুসারে এবং জাতীয় বাজেটের অবদান থাকতে হবে,ঋণ নির্ভর প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরি করা থেকে সরে আসতে হবে। অন্যথায় জলবায়ু অর্থায়নের নামে ঋণ নির্ভরতা ও শর্তের জটিলতার ফাঁদে পড়তে হবে।

গ. প্রতিশ্রুত ৩০০ বিলিয়ন তহবিলে প্রশমন এবং অভিযোজনের জন্য পৃথক তহবিল ঘোষনার দাবি

বলা হচ্ছে প্রতিশ্রুত ৩০০ বিলিয়ন তহবিলের অর্থ দরিদ্র দেশগুলোর অর্থনীতিকে আরও পরিবেশবান্ধব করতে এবং দেশগুলোতে জলবায়ু সংকটের কারণে সৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবিলায় খরচ করা হবে। কিন্তু আর্থিক কাঠামো সংস্কার না করে গতানুগতিক প্রক্রিয়ায় অর্থায়ন করা হলে আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর অভীষ্টলক্ষ্য অর্জীত হলেও বাংলাদেশের মতো অজলবায়ু বিপদাপন্ন দেশগুলো প্রকৃতভাবে উপকৃত হবেনা। যেহেতু প্রতিশ্রুত তহবিলে অভিযোজন ও প্রশমনভিত্তিক অর্থায়নের পরিমাণগত দিকটির উল্ল্যেখ নেই, তাই ধারনা করা হচ্ছে প্রশমনের ক্ষেত্রে অর্থায়ন হলেও অভিযোজনের জন্য চাহিদার তুলনায় বরাদ্দ বরাবরের মতোই কম পাওয়া যাবে। যেহেতু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অভিযোজন অগ্রাধিকার তাই বাংলাদেশের উচিত হবে প্রশমন ও অভিযোজনের জন্য সুনির্দীষ্টভাবে পৃথক তহবিলের [৫০:৫০] দাবি জোড়ালো করা।

ঘ. জলবায়ু অর্থায়নের সুস্পষ্ট সংজ্ঞা নির্ধারনে জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে

জলবায়ু অর্থায়নের সুস্পষ্ট সংজ্ঞা নির্ধারণ অতিব জরুরী, কোনটি জলবায়ু অর্থায়ন আর কোনটি নয় বিষয়গুলোর সুস্পষ্ট সুরাহা হওয়া উচিৎ, অন্যথায় ধনীদেশগুলো যে কোন প্রকার অর্থায়নকেই জলবায়ু অর্থায়নের নামে জোড়করে চাপিয়ে দেবে, এ ধরনের পূর্ব অভিজ্ঞতা আমাদের রয়েছে যেমন-জাইকা প্রকল্পের অধীনে মাতারবাড়ি প্রকল্পের পুরো অর্থায়নকেই জলবায়ু অর্থায়ন হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে এবং বাংলাদেশ তা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে শুধু মাত্র জলবায়ু অর্থায়নের সুনির্দীষ্ট সংজ্ঞা না থাকায়। জলবায়ু অর্থায়নের সুনির্দীস্ট সংজ্ঞায়ন না থাকার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে যে যেভাবে পারছে সেভাবেই যে কোন তহবিলকে জলবায়ু তহবিলের নামে চাপিয়ে দেয়ার সুযোগ পাচ্ছে। এছারাও উন্নত দেশগুলোর বিরুদ্ধে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে দেওয়া ঋণ অর্ন্তভুক্তির পাশপাশি ডাবল কাউন্টিং এর অভিযোগ রয়েছে। তাই বাংলাদেশের উচিত হবে অব্যাহতভাবে একটি জলবায়ু অর্থায়নের সুনির্দীষ্ট সংজ্ঞায়নের জন্য জোড় প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।